কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউকার মিল সাক্‌তি হ্যায়

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
বাংলাদেশ

কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?

(গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউকার মিল সাক্‌তি হ্যায়)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

ভাষান্তর

মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা

গ্রন্থস্বত্ত্ব	ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.
প্রকাশক	আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
ভাষান্তর	মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা
প্রথম বাংলা অনুবাদ	মহররম, ১৪২২ বৈশাখ, ১৪০৮ এপ্রিল, ২০০১
দ্বিতীয় বাংলা সংস্করণ	শাবান, ১৪৩৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ মে, ২০১৬
সংখ্যা	২০০০ কপি
মুদ্রণ	ইন্টারকন এসোসিয়েটস ৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

How to get Rid of The Bondage of Sin	By **Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian** Promised Messiah & Imam Mahdi[as]
কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?	*Translated into Bengaly by* **Muhammad Fazlul Karim Mollah**
	Published by Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
	ISBN : 978 985 991-062-6

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রণীত **"গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউকার মিল সাক্তি হ্যায়?"** (কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?) শীর্ষক প্রবন্ধটি জানুয়ারি ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে কাদিয়ানে **"রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স"** (উর্দূ) পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স (ইংরেজী) ২১শে জানুয়ারি, ১৯০২-এ প্রকাশিত প্রথম সংখ্যায়ও প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত করা হয়েছিল। রাশিয়ার আধুনিক সাহিত্য বিশারদ **টলষ্টয়** উক্ত প্রবন্ধটি পাঠ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন : ***"I approved very much two articles, 'How to Get Rid of Sin' and 'The Life to Come' The idea is very profound and very true." (As recorded in Review of Religions, September, 1911)***

এ প্রবন্ধটি কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাবওয়া কর্তৃক ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ সনে বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়। জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব উক্ত প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা পাক্ষিক আহমদীতে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে চরম নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে যেখানে পাপকে রং-তুলি দিয়ে শোভন করে দেখানো হচ্ছে, সেখানে মানব জাতিকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে, বিশেষ করে আহমদী ভাই-বোন এবং নতুন প্রজন্মকে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে সাবেক ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী সাহেবের অনুপ্রেরণায় প্রবন্ধটি বাংলায় **"কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?"** নামক পুস্তিকা আকারে প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে।

তৎকালীন সেক্রেটারী পাবলিকেশন্স জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব বঙ্গানুবাদটি দেখে দিয়েছেন এবং এর প্রুফ দেখেছেন জনাব মুহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব ও জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব। পুস্তিকাটির মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হল। আল্লাহ তা'লা এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন॥

মোবাশশের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

কীভাবে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়?
গুনাহ্ সে নাজাত কিঁউকার মিল সাক্তি হ্যায়

এ পুস্তিকার মাধ্যমে আমরা দুনিয়ার সমক্ষে এ বিষয়টি তুলে ধরতে চাই যে, জাগতিক দিক থেকে আমাদের বর্তমান যুগ যেরূপ উন্নতি সাধন করেছে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অনুরূপ এর অবনতিও ঘটেছে। এমনকি পবিত্র সত্যতাকে স্পর্শ করার অর্থাৎ জানার ধৈর্যটুকুও মানবাত্মায় অবশিষ্ট নেই। বরং মানুষের সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন প্রবল অদৃশ্য আকর্ষণ যেন তাকে অধ:পতনের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিমূহূর্তে সে এক গর্তের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অন্য কথায় যাকে 'হীন থেকে হীনতর স্তর' বলা যেতে পারে। মানুষের চিন্তা-চেতনা ও বিচারশক্তির এরূপ এক বিপ্লব ঘটেছে যে, সে এরূপ জিনিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ যা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে অতি ঘৃণ্য ও কুৎসিত। প্রত্যেক বিবেক এটা অনুভব করছে যে, কোন এক আকর্ষণ তাকে অধ:পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এরূপ ধ্বংসকারী আকর্ষণের ফলে জগতের এক অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। খাঁটি ও পবিত্র সত্যকে হাসি-বিদ্রূপ ও তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে এবং প্রকৃত আল্লাহমুখী হওয়া অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণ করাকে নির্বুদ্ধিতা জ্ঞান করা হচ্ছে। পৃথিবীতে বসবাসকারী সব আত্মাকে জাগতিক সুখ ভোগে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়তে দেখা যাচ্ছে। মনে হয় অদৃশ্য কোন এক প্রবল আকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তারা অপারগ ও বাধ্য হয়ে পড়ছে। এ কথাগুলোই আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, পৃথিবীর সকল ক্রিয়াকর্ম এক আকর্ষণের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে। যেক্ষেত্রে একীনের (নিশ্চিত বিশ্বাসের) শক্তির প্রাধান্য থাকে সেখানে বিপরীত সত্তাকে সে নিজের দিকে টেনে নেয়। কাজেই এ দর্শন বা নীতি খুবই বাস্তব যে, এক আকর্ষণকে কেবল ঐ আকর্ষণই প্রতিরোধ করতে পারে যা এর চেয়ে অধিক প্রবল ও শক্তিশালী। তেমনিভাবে পৃথিবী যে আজ এক অশুভ আকর্ষণের ফলে নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে এর ঊর্ধ্বমুখী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, যে পর্যন্ত না এরূপ এক বিপরীত ও শক্তিশালী আকর্ষণ আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রতিপক্ষের প্রত্যয় ও বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে যেমন কুপ্রবৃত্তির অপকর্মে স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হচ্ছে, তেমনিভাবে আল্লাহ্র আদেশ পালনে যে এর চেয়েও অধিক কল্যাণ ও উপকার মানুষ দেখতে পায় এবং 'পাপকর্ম মৃত্যুর সমতুল্য'-এ সত্যটিও যেন নিশ্চিতরূপে তার নিকটে প্রতিভাত হয়। এ নিশ্চয়তার আলো আকাশ থেকে কেবল ঐ সূর্যের মাধ্যমে এসে থাকে 'যিনি যুগের ইমাম হন।' সুতরাং এ ইমামকে গ্রহণ না করলে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করতে হবে। যে ব্যক্তি বলে যে, 'আমি এ সূর্যের আলো চাই না, সে খোদার নির্ধারিত বিধানকে ভেঙে দিতে চায়। সূর্যের অনুপস্থিতিতে চোখের পক্ষে কি দেখা সম্ভব? চোখে আলো থাকা সত্ত্বেও তা সূর্যের

মুখাপেক্ষী। সূর্য হলো প্রকৃত আলো যা আকাশ থেকে এসে পৃথিবীকে আলোকিত করে এবং যার অবর্তমানে চোখ অন্ধ। এ স্বর্গীয় জ্যোতি: দ্বারা যার মধ্যে নিশ্চিত বিশ্বাসের সৃষ্টি হবে, পুণ্য কর্মের প্রতিও তার এক আকর্ষণ সৃষ্টি হবে। এ স্বর্গীয় ও জাগতিক আকর্ষণের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা, এরূপ ক্ষেত্রে একটা আকর্ষণ পুণ্যের দিকে অপরটি পাপের দিকে টানবে এবং একটি পূর্ব দিকে, অপরটি পশ্চিম দিকে ধাক্কা দেবে। সেক্ষেত্রে উভয়ের পরস্পর সংঘর্ষ হবে খুব ভয়াবহ। তখন দু' পক্ষেরই চরম আকর্ষণ বিদ্যমান থাকবে যার বিদ্যমানতা পার্থিব চূড়ান্ত উন্নতি লাভের জন্য অত্যাবশ্যক। অতএব যখন তোমরা দেখবে পৃথিবী চরম উন্নতি লাভ করেছে তখন বুঝতে হবে এটি ঐশী উন্নতিরও যুগ। নিশ্চিত জেনে রেখো যে, আকাশেও এক আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি চলছে এবং সেখানেও এক আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে গেছে যা পৃথিবীর আকর্ষণের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে। সুতরাং এরূপ দিন ভীষণ ভয়াবহ হবে যখন পৃথিবীতে অবহেলা ও আত্মশ্লাঘা বেড়ে যাবে। কারণ এটা হলো আধ্যাত্মিক সংগ্রামের প্রতিশ্রুত দিবস, নবীগণ যে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের রূপকের ভাষায় বর্ণনা দিয়ে গেছেন। আবার কেউ কেউ এ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আকাশের ফিরিশতা ও পৃথিবীর শয়তানের মধ্যে এটা শেষ যুদ্ধ যখন পৃথিবীর পরিসমাপ্তি ঘটবে। আবার কেউ মুর্খতা ও অজ্ঞতাবশত: এ যুদ্ধকে বাহ্যিক তরবারি ও বন্দুকের যুদ্ধ বলে মনে করেছে। কিন্তু এসব লোক ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। অধ:পতিত বিবেক ও নির্বুদ্ধিতার কারণে আধ্যাত্মিক যুদ্ধকে তারা জাগতিক যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

মোটকথা, বর্তমানে মর্ত্যের অন্ধকার ও স্বর্গের জ্যোতির মধ্যে ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ চলছে। আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পবিত্র নবীগণ সকলেই এ যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করে এসেছেন। এ যুদ্ধের সেনানায়কদের দু'টি ভিন্ন নাম রাখা হয়েছে। একজন সত্যকে গোপনকারী, অপরজন সত্যকে প্রকাশকারী। অথবা অন্য কথায় বলা হয়েছে– আকাশ থেকে জ্যোতির্মান ফিরিশতাগণের সাথে অবতরণকারী একজন হবেন মিকাঈল (আ.)-এর প্রকাশক এবং অপরজন দুনিয়ার সব শয়তানী অন্ধকারসহ আত্মপ্রকাশ করবে ইবলীসের রূপক হয়ে।

বর্তমানে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি– দুনিয়ার সৈন্যদল অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে তাদের কাজ-কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে বরং অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন স্বভাবত: মনে এ পুণ্য বাসনার উদ্রেক হয় এবং বিবেক ও ন্যায়-বিচার এটাই সাক্ষ্য দেয় যে, স্বর্গীয় প্রশাসন ওদের প্রস্তুতি সম্বন্ধে অচেতন নয়। এ স্বর্গীয় গভর্নমেন্ট স্বভাবত হৈ-হুল্লোড় ও শোরগোল পছন্দ করেন না এবং অতি সংগোপনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে নেন যা কেউ টেরও পায় না; তখনই আকাশ থেকে এক নিদর্শন প্রকাশিত হয় এবং পৃথিবীতে নির্মিত হয় উজ্জ্বল এবং অতি শুভ্র এক মিনার। ঐ স্বর্গীয় আলো মিনারের উপর পড়ে, যা দ্বারা পরবর্তীতে এ মিনার সারা দুনিয়াকে আলোকিত করে।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। ব্যাখ্যাটি এরূপ :

খোদাতা'লার আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা পার্থিব ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ অনুরূপ হওয়া সত্ত্বেও কতক বিষয়ে এতে এরূপ বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা জড় ব্যবস্থাপনায় প্রকাশ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। সুতরাং এসবের মধ্যে এটাও এক বৈশিষ্ট্য যে, যখন নিম্নতর (পার্থিব) আকর্ষণ ক্রীয়াশীল হয়, যদিও তা স্বর্গীয় আকর্ষণের সম্পূর্ণ বিপরীত, তথাপি এ আকর্ষণের স্বাভাবিক চাহিদায় স্বর্গীয় আকর্ষণ সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং এটা যুক্তিসংগত যে, পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ যুগে যেহেতু উভয় আকর্ষণ ক্ষমতা ও শক্তির চরম পর্যায়ে রয়েছে তাদের মধ্যে একটা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন ছিল। কেননা, গৌরব অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করে দিতে হয়। সুতরাং যেক্ষেত্রে দু' প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ে সমভাবে সমৃদ্ধি ও শক্তির অধিকারী সেক্ষেত্রে যুদ্ধ তাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ খোদা তা'লার প্রেরিত প্রত্যেক নবীর গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে এ বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও এটা সমর্থন করে। কেননা, দু' প্রতিপক্ষও শক্তিশালী আকর্ষনের পরস্পর সংঘর্ষে অবশ্য একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে অথবা উভয়েই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ যুদ্ধ সম্বন্ধে নবীগণের গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আগমনের পুরো এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে যখন শয়তানকে শৃংঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল- পাপের আকর্ষণ তখন পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা সে যুগ, যখন ইসলাম এর পবিত্র নীতির দিক থেকে পতনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। সেটির আধ্যাত্মিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং প্রকাশ্য বিজয়েরও পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। শয়তান শৃঙ্খলিত হবার দিন থেকেই তা জন্ম লাভ করেছে। নিশ্চয় এরূপই হবার কথা ছিল, কারণ এ সম্বন্ধে সব নবীসহ বিজ্ঞ ইউহান্না পর্যন্ত সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। খ্রিষ্টীয় ১০০০ সালে শয়তানের ছাড়া পাবার পর থেকে ইসলামের পতন শুরু হয় ও এর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন কলাকৌশলে শয়তানের ক্রিয়াকর্ম শুরু হলে পৃথিবীতে এর চারা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ শয়তানী বৃক্ষের কতক শাখা পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে আর কতক পশ্চিমের জনবসতির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে এবং কতক দক্ষিণে ও উত্তরে বিস্তৃত হতে থাকে। বাহ্যিক ঘটনাবলী যেমন সাক্ষ্য দেয় যে, শয়তানের কারারুদ্ধ থাকার সময়কাল এক হাজার বছর ছিল, অনুরূপভাবে নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ীও শয়তানের কারামুক্ত হবার সময়কাল এক হাজার বছর, যা হিজরতের চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে পূর্ণ হয়। কিন্তু এ এক হাজার বছরের হিসাব খোদা তা'লা নির্ধারণ করেছেন। ভবিষ্যদ্বাণীর সময় চিহ্নিত করার জন্য চাঁদের হিসাব অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইহুদী ও মুসলমানকে এ হিসাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সৌর বছরের হিসাব মানুষের আবিষ্কার, এবং তা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শিক্ষার পরিপন্থী। মোটকথা, এ হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে যে সময়টিতে আমরা অবস্থান করছি সেটাই শয়তানের অবকাশের শেষ সময় বরং একথাও বলা চলে যে, সে সময় পার হয়ে গেছে। কারণ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে শয়তানের কারামুক্তির যে এক হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে তা থেকে উনিশ বছর (এটা ১৯০২ সনের কথা। বর্তমানে ২০১৬

সনে তা হবে ১৩৩ বছর পূর্বে- প্রকাশক) অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর শয়তান এটা চাবে না যে, ওর স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব কেউ ছিনিয়ে নিক। অগত্যা এ দু' আকর্ষণের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হতেই হবে। শুরু থেকেই এটা নির্ধারিত ছিল। খোদা তা'লার এ বাণী মিথ্যা হবে, তা অসম্ভব।

এ যুগ সম্বন্ধে আরও একটি সাক্ষ্য রয়েছে তা হচ্ছে: দুনিয়ার শুরু থেকে অর্থাৎ আদম (আ.)-এর আবির্ভাবের পর থেকে আজ পর্যন্ত ছয় হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে, এর মধ্যে দ্বিতীয় আদমের জন্ম হবার কথা ছিল। কারণ, ষষ্ঠ দিন আদমের জন্ম হবার দিন। খোদা তা'লার সব পবিত্র কিতাব অনুযায়ী এক হাজার বছর এক দিনের সমান। সুতরাং খোদা তা'লার পবিত্র প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সে আদমের জন্ম হয়ে গেছে যদিও সম্পূর্ণরূপে তাকে সনাক্ত করা হয় নি। এর সাথে সাথে একথাও মানতে হবে যে, এ আদমের আগমনস্থল পূর্ব দিকে হবে, পশ্চিমে নয়। আগে থেকেই আল্লাহ্ স্বয়ং তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। কেননা, তওরাতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের আট নম্বর শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়– আদমকে একটা বাগানের পূর্বদিকে রাখা হয়েছিল। সুতরাং দ্বিতীয় আদমেরও পূর্বদিকে আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক, যাতে করে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয়ের আগমনস্থল সম্পর্কে সামঞ্জস্য বজায় থাকে। নাস্তিকতার প্রবৃত্তি না থাকলে মুসলমান ও খ্রিষ্টান কারও পক্ষে একথা স্বীকার না করে গত্যন্তর নেই। অতএব, প্রকৃত সত্যকে জানতে ও বুঝতে এখন আর কোনো অসুবিধা থাকলো না।

এটা অতি সুস্পষ্ট যে, বর্তমান যুগ আলো-আঁধারের সংঘর্ষের যুগ। অন্ধকারের দৌরাত্ম্য চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। ঐশী–আলোর অবতরণ ব্যতিরেকে এ অন্ধকারের উপর বিজয় লাভের আশা করা যায় না। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে, অন্ধকারের (শয়তানের) এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। ন্যায়পরায়ণতার অর্ধমৃত আলো নিবু-নিবু প্রায়। গতানুগতিক ধর্ম-বিশ্বাস, অকেজো জ্ঞান ও নামায সে হারানো আলোকে পুনর্বাসিত করতে পারবে না। অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? কক্ষনো না। অন্ধকার কি অন্ধকারকে বিদূরিত করতে পারে? কখনো তা সম্ভব নয়। এখন তো এক নূতন মিনারের প্রয়োজন যা পৃথিবীতে তৈরী হবে এবং যার উচ্চতা নিম্নের (পৃথিবীর) জনবসতির চাইতে এরূপ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে যাতে করে এর ওপরে ঐশী জ্যোতির অবতরণ হয় এবং স্বর্গীয় প্রদীপ (আলো) তাতে রাখা যেতে পারে এবং যার ফলে সারা দুনিয়া এ জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। কেননা, প্রদীপ (আলো) ওপরে রাখা না হলে কি করে এর ছটা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে?

মিনার কি বস্তু তা আপনাদেরকে বলা হয় নি। সুতরাং স্মরণ রাখতে হবে- মিনার ঐ পূতপবিত্র আত্মা ও উচ্চ সাহসিকতার নাম যা সিদ্ধ পুরুষগণ লাভ করে থাকেন, যারা স্বর্গীয় জ্যোতি: লাভের যোগ্য, মিনারের অর্থের মধ্যে যেমনটি এর উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তেমনই মিনারের উচ্চতা বলতে বোঝায় ঐ ব্যক্তির উচ্চ সাহসিকতা এবং মিনারের শক্ত বা মজবুত হবার অর্থ হলো– বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সময় মানুষ যে

দৃঢ়তা ও স্থিরতা প্রদর্শন করে থাকে; এবং এর শুভ্রতা হলো– নির্দোষিতা বা দোষ-মুক্তি যা পরিণামে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ সব কিছু ঘটে যাবার পর অর্থাৎ যখন এ সিদ্ধ পুরুষের উচ্চ সাহসিকতা পরিপূর্ণ স্থৈর্য-ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা এবং চূড়ান্ত যুক্তি-প্রমাণে তার নির্দোষিতা এক উজ্জ্বল মিনারের ন্যায় প্রতিভাত হয় তখন তার গৌরবময় আবির্ভাবের সময় এসে যায় এবং তার প্রথম আবির্ভাবের পরীক্ষাকালীন দুর্যোগপূর্ণ সময়ের অবসান ঘটে। তখন এ আধ্যাত্মিকতা খোদা তা'লার প্রতাপে প্রতাপান্বিত হয়ে ঐ মিনার সদৃশ সত্তার উপর অবতীর্ণ হয় এবং ঐশী-নির্দেশে তখন স্বর্গীয় গুণাবলী তার মধ্যে সৃষ্টি হয়। এ সবকিছুই তার দ্বিতীয় আবির্ভাবকালে ঘটে।

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশেষ ধরনের আগমন হলো এ সত্যেরই প্রতিচ্ছবি। মুসলমানদের ধারণামতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) মিনারের নিকট অবতরণ করবেন। 'অবতরণ' বলতে এক বিশেষ প্রতাপপূর্ণ আগমন বুঝায় যাতে খোদা তা'লার গুণাবলী নিহিত থাকে। এটা নয় যে, এর পূর্বে পৃথিবীতে তার অবস্থান ছিল না, কিন্তু এটা আবশ্যক যে, খোদা তা'লার নির্ধারিত সময়ে আগমন সাপেক্ষে আকাশ তাঁকে আগলে রাখবে। এটাও খোদা তা'লার বিধানের অন্তর্ভূক্ত যে, আধ্যাত্মিক বিষয়কে দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করানোর ক্ষেত্রে তিনি এর কতকাংশের বাহ্যিক প্রতীকও সৃষ্টি করে থাকেন। যেরূপ বায়তুল মুকাদ্দসের হেইকল (ইবাদত ঘর) ও মক্কাশরীফের কা'বা ঘর, এ দু'টি আধ্যাত্মিক জ্যোতির্বিকাশের প্রতীক। এরই ভিত্তিতে ইসলামী বিধানমতে বুঝা যায় যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) মিনারের ওপর অথবা মিনারের নিকটবর্তী স্থানে অবতীর্ণ হবেন, এমন এক দেশে যা দামেস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত, যেরূপভাবে আদম (আ.)-কেও পূর্ব দিকে জায়গা দেয়া হয়েছিল। এ প্রতাপপূর্ণ আগমনের পূর্বে বাহ্যিক মিনার তৈরিতেও কোন বাধা নেই বরং ভবিষ্যদ্বাণীরূপে হাদীসে এ কথার উল্লেখ রয়েছে যে– ঐ মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতাপপূর্ণ আগমনের একটা নিদর্শন হবে যা তার আগমনের পূর্বেই তৈরী করা হবে। এটা নির্ধারিত যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) দু'রকমের পরিস্থিতিতে আগমন করবেন। প্রথমত: সাধারণভাবে তার আগমন যা বিভিন্ন রকম পরীক্ষা ও বিপদাবলিতে পরিপূর্ণ ও নানা প্রকার দু:খ-কষ্টের সময়। এ মেয়াদ পূর্ণ হয়ে গেলে তার প্রতাপপূর্ণ আগমনের সময় আসবে। এটা জরুরী যে, তার পূর্বে একটি মিনার তৈরী হবে। যেরূপে হাদীসে বর্ণিত আছে, 'এ সত্যতার পরিচয়স্বরূপ এক বাহ্যিক মিনার থাকবে যা আধ্যাত্মিক মিনারের প্রতীক হবে'। তার প্রতাপপূর্ণ আগমনের পূর্বে দুনিয়া তাকে চিনতে পারবে না। কেননা তিনি দুনিয়া থেকে নন এবং দুনিয়া তাকে ভালোবাসবে না এবং যে খোদার পক্ষ থেকে তিনি এসেছেন সে খোদার সাথেও দুনিয়ার ভালোবাসা নেই। সুতরাং এটাই হবার ছিল– তার প্রথম আবির্ভাবের সময় তাকে দু:খ-কষ্ট দেয়া হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আনা হবে। যেমন ইসলামী ভবিষ্যদ্বাণীতে লিখিত আছে- শুরুতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লোকে গ্রহণ করবে না, অজ্ঞ লোকদের হিংসা বেড়ে যাবে এবং তাদের দুষ্টামী শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছবে। এমন কি তার ওপর যুলুম-অত্যাচার করে মানুষ মনে করবে যে বড় একটি পুণ্যকর্ম সাধন করেছে এবং তাকে দু:খ-কষ্ট দিয়ে কেউ মনে করবে যে, সে

এ কাজ করে খোদাকে সুন্তুষ্ট করেছে এবং এরূপ চলতে থাকবে। ভূমিকম্প-সদৃশ সর্বপ্রকার দুর্যোগ তার ওপর আপতিত হবে এবং তিনি সর্বপ্রকারের বিপদাবলীর সম্মুখীন হবেন। এমন কি আল্লাহ্‌র বিধান পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন তার প্রতাপপূর্ণ আগমনের সময় এসে যাবে এবং অপেক্ষমান অন্তরসমূহের চক্ষু উন্মিলিত হবে। তখন নিজেরাই ভাবতে থাকবে ব্যাপার কী? এটা কিরকম মিথ্যা দাবিকারক যে, পরাভূত হয় না? কেন খোদার সাহায্য সমর্থন তার সাথে রয়েছে, আর আমাদের সাথে নেই? তখন খোদা তা'লার এক ফিরিশতা তাদের অন্তরে অবতরণ করবেন। তিনি তাদেরকে বুঝাবেন– তোমাদের হাদীস ও বর্ণনাগুলোর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াটা কি অবশ্যি জরুরী যা তোমাদের প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে আছে? এগুলোর মধ্যে কতকগুলো বানানো আর কতকগুলোতে ভুল-ত্রুটি থাকা কি সম্ভব নয়? রূপকভাবে কতক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়া কি বিধিসম্মত নয়? ইহুদীদের [ঈসা (আ.)-কে অস্বীকার করার] দূর্ভাগ্যের কারণ এছাড়া আর কি ছিল যে- সবগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর বাহ্যিকভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণতার জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল এবং তারা চেয়েছিল- সবকিছুই তাদের ধারণামত সংঘটিত হবে, কিন্তু তা হয় নি। সুতরাং যেহেতু সে একই খোদা আপন অলঙ্ঘনীয় বিধানসহ এখনো বিদ্যমান রয়েছেন, সেক্ষেত্রে কেন এটা সংগত হবে না যে, তদ্রূপ তোমাদেরকেও একই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়? মোটকথা, পরিণামে একই ধারণার প্রতি স্বভাবত: মানুষের মন প্রত্যাবর্তন করবে- আদিকাল থেকে যেভাবে চলে আসছে।

কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, সত্য ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতা বিস্তারের জন্য এটা বাস্তব যুদ্ধের যুগ। তরবারী সত্যের গুণাবলি বা তাৎপর্যের বিকাশ ঘটাতে পারে না বরং ওগুলোকে আরও দাবিয়ে রাখে ও সন্দেহপূর্ণ করে তোলে। এরূপ ধারণা যারা পোষণ করে তারা ইসলামের বন্ধু নয় বরং শত্রু। তাদের স্বভাব অতি নীচ ও ঘৃণিত, তারা কাপুরুষ ও সংকীর্ণমনা, তাদের মস্তিষ্ক নিস্তেজ ও প্রকৃতি তমসাচ্ছন্ন। কারণ, বিরুদ্ধবাদীগণের হাতে তারা এমন এক আপত্তির সুযোগ তুলে দেয় যা প্রকৃতপক্ষে কিছুটা যুক্তিযুক্ত। কেননা, তাদের মতে ইসলাম নিজ উন্নতিকল্পে যুদ্ধের মুখাপেক্ষী এবং যা ইসলামের নামে এক অপবাদ। কারণ, যে ধর্ম প্রজ্ঞাপূর্ণ-যুক্তি বা অন্যান্য নানারকম গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য অথবা ঐশী নিদর্শন দ্বারা অতি সহজে আপন সত্যতা প্রমাণে সমর্থ, এরূপ ধর্মের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ও তরবারীর ভয় দেখিয়ে নিজের সত্যতা স্বীকার করানোর কোনই প্রয়োজন নেই। কিন্তু যে ধর্মে এ স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত এবং তার দুর্বলতা ঢাকার জন্য তরবারী ব্যবহার করে, সেক্ষেত্রে এরূপ ধর্মের মিথ্যা সাব্যস্ত হবার জন্য আর কোন প্রমানের প্রয়োজন নেই। তাকে কর্তন করার জন্য তার নিজের তরবারীই যথেষ্ট।

'এখন জেহাদ বিধিসম্মত নয়'–এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যদি বলা হয় প্রাথমিক যুগে ইসলামে কেন তরবারী ব্যবহার করা হয়েছিল, তাহলে এটা আপত্তিকারীর নিজের ভুল যা তার অজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এটা এদের জানা নেই যে, ধর্ম প্রচারের জন্য ইসলাম কখনো বল প্রয়োগের অনুমতি দেয় না। দেখ, কুরআন

শরীফে কীরূপ নিষেধাজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে! বলা হচ্ছে- **'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'** অর্থাৎ ধর্মে বল প্রয়োগ করা উচিত নয়। তাহলে কেন তরবারী উঠানো হলো? এর প্রকৃত তত্ত্ব হলো আরবের অসভ্যজাতি যাদের মধ্যে ভাল-মন্দের পার্থক্য করার বিচারশক্তি এবং ভদ্রতা অবশিষ্ট ছিল না, তারা ইসলাম ও মুসলমানদের কঠোর দুশমন হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্‌র একত্ব ও ইসলামের সত্যতার সমর্থনে সুস্পষ্ট, অকাট্য ও পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তাদেরকে যখন বুঝানো হলো যে, মানুষের পক্ষে পাথরকে পূজা করা এক প্রকাশ্য ভ্রান্তি এবং তা মনুষ্যত্বেরও বিপরীত, তারা তখন যুক্তিপূর্ণ কথার কোন জবাব দিতে পারে নি। তাদের এ অপারগতায় বুদ্ধিমান লোকেরা ইসলামের দিকে এগুতে থাকে। ফলে ভাই-ভাই ও পিতা-পুত্রের সম্পর্ক পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন নিজেদের মিথ্যা ধর্ম রক্ষা-কল্পে এছাড়া কোন প্রতিকারই তারা চিন্তা করতে পারে নি যে, কঠিন ও কঠোর শাস্তির মাধ্যমে লোকদেরকে মুসলমান হওয়া থেকে বিরত রাখে। সুতরাং পবিত্র মক্কায় আবু জাহল ও মক্কার অন্যান্য নেতৃস্থানীয়রা এ কার্যক্রম শুরু করে দেয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই বিশেষ অবগত আছেন যে, এরূপ কতই না হৃদয়হীন ঘটনা বিরুদ্ধবাদীগণের দ্বারা মক্কাতে সংঘটিত হয়েছে এবং কত নিষ্পাপ মানুষ তাদের অত্যাচারে প্রাণ হারিয়েছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ মুসলমান হওয়া থেকে বিরত থাকে নি। কারণ, প্রত্যেক সাধারণ মোটাবুদ্ধির লোকও জানতো যে, পৌত্তলিকতার মোকাবেলায় ইসলামে কীরূপ যুক্তি-যুক্ততা ও ঐজ্জ্বল্য রয়েছে। এ ব্যবস্থায় (যুক্তি-তর্কে) সফলতা লাভে ব্যর্থ হয়ে অগত্যা স্থির করে যে, স্বয়ং আঁ-হযরত (স.)-কেই তারা হত্যা করবে। কিন্তু খোদা তা'লা তাঁকে রক্ষা করে মদীনায় নিয়ে গেলেন। এরপরও তারা মুসলমানগণকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং কোন অবস্থাতেই নিজেদের দুষ্টামী ছাড়তে চাইলো না। এমতাবস্থায় আক্রমণকারীদের অন্যায় আক্রমণ প্রতিহত করে তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছাড়া ইসলামের জন্য আর কী করার ছিল? সুতরাং ইসলামের জেহাদ ধর্ম বিস্তারের জন্য ছিল না বরং তা ছিল মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য। কোন সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি কি একথা মেনে নিতে পারে যে, ইসলাম ইতোপূর্বেও আপন তৌহীদের (আল্লাহ্‌র একত্বের) যৌক্তিকতা বর্বর মূর্তি-পূজারীদের নিকট প্রমাণ করতে অক্ষম ছিল? কোন বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক কি একথা বিশ্বাস করতে পারে যে, সেই পৌত্তলিক যারা পাথর ও জড় বস্তুর পূজা করতো এবং বিভিন্ন রকমের পাপকর্মে লিপ্ত থাকতো, তাদের সাথেও যুক্তি-প্রমাণে পরাজিত হয়ে ইসলাম তরবারী ব্যবহার করতে চেয়েছিল? মা'আযাল্লাহ্ (আল্লাহ্ রক্ষা করুন)! এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। যারা ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেছে যুলুমের মাধ্যমে, তারা সত্যকে গোপন করেছে।

হ্যাঁ, একথা সত্যি যে, মৌলবীরা যেমন এ যুলুম–অন্যায়ে অংশগ্রহণ করেছেন তদ্রূপ খ্রিষ্টান পাদ্রীগণও তাদের চেয়ে কম যান নি। ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের আপত্তি এনে পাদ্রীগণ অজ্ঞ মৌলবীদের ধ্যান-ধারণাকে সাধারণের মনে বদ্ধমূল করে দেয়, ফলে তারা এ ধোঁকায় পড়ে যে, যে অবস্থায় আমাদের মৌলবীগণ জেহাদের ফতওয়া দিয়ে থাকেন এবং বিজ্ঞ ও পণ্ডিত পাদ্রীগণও একই আপত্তি উত্থাপন

করেছেন– কাজেই এতে প্রমাণিত হয় যে, বস্তুত: আমাদের ধর্মে যুদ্ধ প্রচলিত রয়েছে। এ দু'টি পৃথক সাক্ষ্য দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে এ আপত্তি দাঁড় করানোটা কি রকম যুলুম! পাদ্রীগণ এরূপ না করে সততার সাথে ও সত্যের খাতিরে যদি এ কথা বলতেন যে, মৌলবীগণের এ ফতওয়া তাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফসল, নতুবা ইসলামের শুরুতে যে অবস্থায় এ (জেহাদের) প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল বর্তমানে এ যুগে সে অবস্থা বিদ্যমান নেই– তাহলে ধর্ম-যুদ্ধের ধারণাই দুনিয়া থেকে উঠে যাবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু (পাদ্রীগণ) নিজেদের বুদ্ধির দৈন্য এবং আপন ধর্মের প্রতি অধিক আবেগ প্রবণতার ফলে সত্যকে জানতে ব্যর্থ হয়েছেন।

হ্যাঁ, একথা সত্য যে, আরববাসীদের অত্যধিক যুলুম ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পর অন্যায় রক্তপাত ঘটানোর অপরাধে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যখন তারা ওয়াজিবুল কতল (মৃত্যুদণ্ড লাভের অপরাধী) বলে সাব্যস্ত হয় তখনই তাদের সকলের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের মৃত্যুদন্ড ক্ষমা করে দেয়া হবে যদি তারা বিশ্বাস আনয়ন করে। সম্ভবত: বিরুদ্ধবাদী নির্বোধেরা এই আদেশের কারণে ধোঁকায় পড়েছে। তারা জানে না যে, এটা বল প্রয়োগ নয় বরং মৃত্যুদণ্ডের অপরাধীদের জন্য এটা এক অনুকম্পাস্বরূপ, এটাকে বল প্রয়োগ বলে গণ্য করার মতো মূর্খতা আর হয় না। তারাতো হত্যাকারী হবার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড লাভের উপযোগী ছিলই, কাফির হিসেবে নয়। করুণাময় খোদা ভাল করেই জানতেন যে, ইসলামের সত্যতা তারা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে। সুতরাং তাঁর করুণা এটাই চাইলো যে, এরূপ মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধীদেরকে তাদের পাপ মোচনের আবারও এক সুযোগ দেয়া যাক। সুতরাং এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, কাউকে হত্যা করা কখনো ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না বরং যারা রক্তপাত ঘটানোর কারণে মৃত্যুদণ্ড লাভের যোগ্য ছিল তাদের জন্যও ক্ষমার একটি পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সে যুগে সর্বত্র ইসলামকে এ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রত্যেক গোত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন গোত্র থেকে কেউ মুসলমান হয়ে গেলে হয় তাকে হত্যা করা হতো নয়তো তার জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে দুর্বিষহ হয়ে যেতো। সেকালে সর্বত্রই ইসলামকে এ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় তখন শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইসলামকে যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং এরূপ দ্বিবিধ অবস্থা ছাড়া ঐ সঙ্কটকালে ইসলাম কখনো যুদ্ধের নামও উচ্চারণ করে নি। ধর্মের নামে যুদ্ধ করা কখনো ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য অযথা একে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং যা কিছু ঘটেছে, নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ ও আত্মরক্ষার জন্যই তা হয়েছে। অজ্ঞ মৌলবীরা এ বিষয়ের অপব্যাখ্যা করে এক নির্লজ্জ হিংস্রতাকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করছে। কিন্তু এটা ইসলামের অপরাধ নয়। এটা তাদের নিজেদের বিবেক-বুদ্ধির অপরাধ যা মানুষের রক্তকে চতুষ্পদ জন্তুর রক্তের চেয়েও কম মূল্য দিয়ে থাকে। এখনও তাদের রক্তের পিপাসা মেটে নি বরং এ কারণেই তারা একজন খুনী মাহদীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। 'ইসলাম প্রচারের জন্য বল প্রয়োগ ও যুলুমের মুখাপেক্ষী ছিল'-এ কথা যেন তারা সকল জাতির নিকট প্রমাণ করতে চাইছে। অথচ এতে সামান্যতম সত্যতার লেশ মাত্রও নেই।

বর্তমানে ইসলাম যেরূপ পতনোম্মুখ অবক্ষয়ের সম্মুখীন হচ্ছে– আমার মনে হয়, এখনকার যুগের কতক মৌলবী এতেও সন্তুষ্ট নন। উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে ইসলামকে তারা আরও নিম্নস্তরে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ চান না যে, ইসলাম এরূপ নিন্দা ও অপবাদের লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত হোক। অজ্ঞ বিরোধীদের জন্য এটা বিরাট পরীক্ষা। তারা এখনো এ ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, প্রাথমিক ও পরবর্তী যুগে ইসলাম আপন জামাত বিস্তারের জন্য তরবারী ব্যবহার করেছে। আসলে বর্তমানে এটা সেই যুগ ও ক্ষণ যখন এ ভ্রান্তিকে দৃঢ় না করে অন্তর থেকে বের করে দিতে হবে। আজ যদি ইসলামের মৌলবীরা একত্রিত হয়ে এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেন যে, তারা সভ্যতা-বিবর্জিত মুসলমানদের মন থেকে ভ্রান্তিকে উপড়ে ফেলবেন তাহলে নিঃসন্দেহে তারা জাতির প্রতি এক বিরাট কৃপা প্রদর্শন করবেন। শুধু এটাই নয় বরং এদ্বারা ইসলামের সৌন্দর্যের সুদৃঢ় ভিত্তির রহস্য সাধারণের মাঝে উদঘাটিত হবে এবং ধর্ম-বিরোধীগণের নিজেদের ভুলের কারণে ইসলাম সম্বন্ধে তাদের বিরূপ ভাব দূর হতে থাকবে। তখন তাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে অচিরেই ঐ আলোর প্রস্রবণ থেকে আশীষ লাভ করবে। এটা জানা কথা যে, একজন খুনী ব্যক্তির নিকট কেউ আসতে পারে না, প্রত্যেকেই তাকে ভয় করে। বিশেষ করে শিশু ও মহিলারা তাকে দেখলে কেঁপে ওঠে এবং তাকে এক পাগলের মতো দেখায়। অন্য ধর্মের একজন বিরোধী লোকও তার সাথে রাত কাটাতে ভীষণ ভয় পায় এ আশঙ্কায় যে, গাজী হবার সাধে রাতে উঠে না তাকে হত্যা করে ফেলে। কেননা, এ পুণ্য লাভের আশায় সীমান্তের কতক আদিবাসী আজও অন্যায়ভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে এই মনে করে যে, আজ আমার এই একটি মাত্র কর্মের দ্বারা বেহেশত লাভ করে এর সমস্ত পুরস্কারের ভাগী হয়ে গিয়েছি। মুসলমানদের জন্য এটা কত লজ্জার কথা যে, বিজাতীয়গণ তাদের প্রতিবেশী হয়ে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে না এবং নিজেদের মনকে কখনো প্রবোধ দিতে পারছে না যে, প্রয়োজনে এ জাতি আমাদের কোন উপকারে আসতে পারে! এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের এরূপ সুপ্ত (অমূলক) বিশ্বাসের কারণে একজন বিজাতীয় লোক সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকছে।

এরকম একটি দৃশ্য আমি দেখেছি। সম্ভবতঃ এটা ১৯০১ সনের ২০শে নভেম্বরের ঘটনা। এক ইংরেজ ভদ্রলোক কাদিয়ানে এসেছেন। আমাদের জামাতের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। তখন কোন ধর্মীয় আলোচনা হচ্ছিল। তিনি এসে এক কোণে দাঁড়ালেন। আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাকে আমার পাশে বসতে দেয়া হলো। জানা গেল তিনি একজন ইংরেজ পর্যটক। আরব দেশও দেখে এসেছেন এবং তিনি আমাদের জামাতের ফটো তুলে নিতে চান। সুতরাং তার এ কাজে তাকে সহায়তা দিয়ে তার সমাদর ও মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এখানে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু মনে হলো একথা শুনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি তখন বললেন- আমি অনেক মুসলমানকে খ্রিষ্টানদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দেখেছি। পরে বাগদাদে সংঘটিত এরূপ কয়েকটি হৃদয়হীন ঘটনার কথা তিনি

শুনালেন। তখন বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে তাকে বুঝানো হলো– এ জামাত, যাকে আহমদী সম্প্রদায় বলা হয়ে থাকে, এরূপ মতবাদের ঘোর বিরোধী এবং এরূপ লোকদেরকে অতি ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। মানবাধিকার সম্বন্ধে এ সম্প্রদায়ের করণীয় হলো– ইসলামের মধ্য থেকে এরূপ ধারণার মূলোৎপাটন করে দেয়া। তখন তিনি মনে স্বস্তি পেলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের সাথে এক রাত অবস্থান করলেন।

এ ঘটনাটি বলার উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের এরূপ ধারণা, যা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, বিজাতীয়দের জন্য তা বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের মনে কু-ধারণা ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে এবং মুসলমানদের প্রকৃত সহানুভূতি সম্পর্কে তাদের সু-ধারণা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। যদি কিছু থেকেও থাকে তবে তা এরূপ লোকদের প্রতি রয়েছে– যারা ধার্মিকের জীবন যাপন করে না এবং ইসলামী অনুশাসন পালনে বিশেষ উদাসীন। অতএব, যেহেতু মুসলমানদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা বৃদ্ধি পেয়েছে যে জন্য তারা নিজেরাই দায়ী, সুতরাং এর চেয়ে বড় কোন পাপ কি হতে পারে যে, এক বিশ্বকে এরূপ ওলামা ও তাদের অনুসারীগণ ইসলামের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছেন? তরবারীর ঝলক না দেখিয়ে যে ধর্ম নিজের শিক্ষা মানুষের মনে প্রবেশ করাতে সমর্থ নয়, সে ধর্ম কি খোদার তরফ থেকে হতে পারে? সে ধর্মইতো সত্য যা লৌহ-নির্মিত তরবারীর মুখাপেক্ষী না হয়ে আপন গুণাবলি, শক্তি ও অকাট্য দলীল-প্রমাণের দ্বারা তরবারীর কাজ সমাধা করতে সক্ষম।

এ হলো (ধর্মীয়) বিপর্যয়ের অবস্থা যা সতত একজন সংস্কারকের আগমনের দাবি জানিয়ে আসছে। ইসলামের ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি তখন এরূপ ভয়াবহ অবস্থা-দৃষ্টে মনে হয় যেন সূর্যগ্রহণ লেগে আছে এবং তার অধিকাংশই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, মাত্র অল্প কিছু বাকী রয়েছে। মুসলমানদের ব্যবহারিক আচরণের অবস্থা করুণারযোগ্য। এরূপ কতক হাদীস রচনা করা হয়েছে যা তাদের চারিত্রিক অবস্থার ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তারা খোদা তা'লার নির্ধারিত বিধানের শত্রু। দৃষ্টান্ত স্বরূপঃ ঐশী বিধানে মানবজাতির জন্য তিন প্রকার অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। যেমন নিষ্পাপ কোন ব্যক্তিকে হত্যা না করা, নিরপরাধ কারও মান-সম্মানে আঘাত না করা এবং বিনা অধিকারে কারও ধন-সম্পদ হস্তগত না করা। কিন্তু আমি দেখছি কতক মুসলমান এ তিনটি আদেশই লঙ্ঘন করছে। একজন নিষ্পাপ লোককে হত্যা করেও ভীত হয় না। তাদের অর্বাচীন মৌলবীরা এরূপ ফতওয়াও দিয়ে রেখেছে যে, বিজাতীয় কোন নারীকে, যাকে তারা কাফির ও বিধর্মী বলে থাকে, কোন বাহানায় তাকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে যাওয়া অথবা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নিজের স্ত্রী বানিয়ে নেয়া জায়েয (বিধিসম্মত)। আবার অনুরূপভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও চুরি করে কাফিরদের মাল আত্মসাৎ করা যায়, এতে কোন পাপ হয় না। এখন চিন্তা করা দরকার– যে ধর্মে এরূপ খারাবী (ধর্মীয় বিপর্যয়) সৃষ্টি হয়ে যায় যেখানে ফতওয়া দানকারী এরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির মৌলবীও বর্তমান থাকে, সে ধর্মের অবস্থা কীরূপ বিপজ্জনক! স্বার্থপর লোক নিজেরা এরূপ ফতওয়া তৈরী করে খোদা ও রসূলের ওপর মিথ্যারোপ করছে। তাদের অনুসরণে অজ্ঞ সভ্যতা-বিবর্জিতেরা যে পাপাচার করে

যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ দায়ভার তারা (মৌলবীরা) বহন করবে। তারা নেকড়ে। মেষের বেশে নিজেদেরকে প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা জীবন-বিধ্বংসী বিষ, কিন্তু নিজেদেরকে উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে জাহির করে থাকে। তারা ইসলাম ও খোদার সৃষ্টির প্রতি কঠোর বিদ্বেষপরায়ণ এবং তাদের অন্তঃকরণ দয়া ও সহানুভূতিশূন্য। কিন্তু আসল চেহারা লুকিয়ে রেখে স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তারা কপটতাপূর্ণ ধর্মোপদেশ দান করে থাকে। ভক্তের বেশে তারা মসজিদে আসে কিন্তু দুষ্কর্মের স্বভাব গোপন থাকে। এটা শুধু কোন এক দেশেরই অবস্থা নয়, না কোন বিশেষ শহর বা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের, বরং সারা ইসলামী দুনিয়ায় এরূপ এক দল রয়েছে যারা ওলামা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় এবং মৌলবীদের আলখাল্লা পরে যথাসম্ভব ধার্মিকের রূপ ধারণ করে, যাতে করে তারা অতি মহৎ ও পুণ্যবান ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু তাদের আচরণ সাক্ষ্য দিচ্ছে তারা কী এবং কোন্ প্রকৃতির লোক! তারা এটা চায় না যে, দুনিয়াতে সত্যিকারের পবিত্রতা ও প্রকৃত সহানুভূতি বিস্তার লাভ করুক। কেননা, এতে যে তাদের নিজেদেরই ক্ষতি!

বস্তুত: বর্তমানে ইসলাম কঠিন বিপদে আক্রান্ত। অধিকাংশ আত্মারই মৃত্যু ঘটেছে। পুণ্যের দিকে এরা সামান্যও এগুচ্ছে না, মিতাচারকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে একদল কবর পূজারী। কা'বা ঘরের ন্যায় তারা সে কবরকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজেদের পীর সাহেবদের আত্মাকে তারা এরূপ শক্তিমান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার অধিকারী বলে জ্ঞান করে, মনে হয় যেন খোদা তা'লার তরফ থেকে তাদেরকে সবকিছুর ক্ষমতা দান করা হয়েছে। অধিকাংশ পীরের আস্তানায় কবরও রয়েছে এবং অনুসারীরা পীরের আদেশে সেই কবর পূজা করে থাকে। কবরবাসীর অলৌকিক গুণাবলী সম্বন্ধে কেউ জানতে চাইলে তার সম্বন্ধে অসংখ্য মনগড়া অলৌকিক ঘটনাবলী শুনানো হয় যার একটিরও প্রমাণ নেই। তাদের মতে ইসলামের মূল হলো কবর পূজা, এবং অপর সকল মুসলমানকে তারা পথভ্রষ্ট মনে করে। এটা সে দল যারা বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করেছে। তাদের মোকাবেলায় হীনমনাদের এক দলও রয়েছে। অস্বীকার করার ব্যাপারে তারা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনতো দূরের কথা, এমনকি নবুওয়তও তাদের জন্য কোন জিনিস নয়। তারা অলৌকিকতার ঘোর বিরোধী এবং এ বিষয়ের ওপর হাসি-বিদ্রূপ করে থাকে। ওহী বা দৈববাণী সম্বন্ধে তাদের ব্যাখ্যা এই– ওগুলো হলো কিতাবধারীর নিজেরই মনের ধারণা ও চিন্তার ফসল। এমন ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা ভাবনাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নেবার তাদের বিশেষ দক্ষতা থাকে। সুতরাং এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী যা প্রকৃত অদৃশ্যের খবর এবং যা তাদের বুদ্ধি-বিবেকের আওতা বহির্ভূত, এসবকে তারা অসম্ভব বলে মনে করে। ফলত: তাদের মতে খোদার নিকট থেকে না কোন ওহী অবতীর্ণ হয়, না মো'জেযা অর্থাৎ অলৌকিক বলে কোন জিনিস আছে এবং না ভবিষ্যদ্বাণী কোন তাৎপর্য বহন করে। মৃতের কবর শুধু মাটির স্তূপ যার সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই; মৃতের জীবিত হওয়া প্রাক-সভ্য যুগের কাহিনী এবং পরকালের জন্য চিন্তা করা উন্মাদনা মাত্র এবং বুদ্ধিমত্তার কাজ হলো– দুনিয়া উপার্জনের দক্ষতা অর্জন করা এবং

যে ব্যক্তি পৃথিবীতে পার্থিব কলাকৌশল নিয়ে দিবা-রাত্র ব্যস্ত থাকে তার অনুকরণ করা, তার মতো হয়ে যাওয়া। এ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা হলো নবুওয়ত ও পরকাল সম্বন্ধে। কিন্তু এছাড়া মুসলমানদের সামাজিক কাজ-কর্মে, কথায় কথায় বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা দেখা যায়। তাদের কথায়-কাজে-স্বভাবে, বিবাহ-তালাকে, স্ত্রী নিয়ে বসবাসে, একতায়, ক্রোধ-করুণায়, প্রতিশোধ-ক্ষমায় কোন ক্ষেত্রেই মিতাচার নেই। সংক্ষেপে, এ জাতির মাঝে আজব ধরনের অনিয়মের ঝড় বয়ে যাচ্ছে, মূর্খতার কোন শেষ নেই- পথভ্রষ্টতার কোন সীমা-পরিসীমাও নেই। আল্লাহ্‌র তৌহীদ ও মধ্যপন্থার পাগড়ী পরে যে জাতির আবির্ভাব হয়েছিল, তাদেরই অমিতাচারের অবস্থা যখন এরূপ, সেক্ষেত্রে অন্য জাতির সম্বন্ধে আক্ষেপ বা আলোচনার আর কী থাকে?

খ্রিস্টানদের কেন্দ্র এমন একটি ক্ষেত্র-স্বরূপ সেখানে উন্নত জ্ঞান ও শক্তিশালী মস্তিষ্কের চরম উৎকর্ষ থেকে অনেক কিছু আশা করা হচ্ছিল কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করে ধর্ম এবং আল্লাহ্‌র একত্বের বিষয়ে তারাও ধ্বংস হয়ে গেছে। একদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জাগতিক ক্রিয়া-কর্মের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা এবং আগামী দিনের নব নব শিল্পের উদ্ভাবনের ব্যাপারে তারা চরম মার্গে উপনীত হয়েছে। আবার যখন অপরদিকে দেখি– খোদা তা'লার পরিচয় লাভের ব্যাপারে তাদের কতটুকু অধঃপতন হয়েছে এবং কীভাবে একজন দুর্বল মানুষকে সমস্ত বিশ্বের প্রভু হিসেবে গণ্য করেছে তখন বিস্ময় জাগে যে, জাগতিক কাজ–কর্মে তারা কত পারঙ্গম আর খোদাকে জানার ব্যাপারে তাদের বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার এরূপ বাহার! যখন চিন্তা করি খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার দিক থেকে বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন কী, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এরূপ আছে যারা মানুষের অধিকার হরণ করে থাকে এবং খ্রিস্টানদের মাঝে এমন লোক রয়েছে যারা খোদার অধিকারকে হরণ করছে। কেননা, জিহাদের মতবাদের ভ্রান্তধারণা মুসলমানদেরকে এমন হৃদয়হীন করে ফেলেছে যে, মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা তাদের অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে অসভ্য শ্রেণীর লোকেরা কীরূপ সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থে অথবা অন্যায় আবেগে নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করতেও প্রস্তুত হয়ে যায়, বিবস্ত্র করে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিতে ওদের বাঁধে না এবং এভাবে তারা মানবজাতির অধিকারের এক প্রয়োজনীয় অংশকে বিনষ্ট করে মানবতার প্রতি কলঙ্ক লেপন করেছে। আবার যখন খ্রিষ্টানদের অবস্থা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করি তখন অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তারা খোদা তা'লার অধিকারকে হরণ করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি এবং একজন দুর্বল মানুষকে অযথা খোদা বানিয়ে রেখেছে। আর যে উদ্দেশ্যে খোদা বানানো হয়েছে তা-ও পূর্ণ হয় নি!

পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের এটাই যদি ব্যবস্থাপত্র হতো যে ঈসা মসীহের রক্তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, তাহলে ইউরোপীয়দের দুনিয়ার পূজা বিভিন্ন প্রকারের অবৈধ যৌন-সম্পর্কিত পাপ থেকে, যার উল্লেখ করতেও লজ্জাবোধ হয়, এ ব্যবস্থাপত্র কেন পবিত্র করতে পারে নি? বরং এর বিপরীতে (ঐ পাপাচার) অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি

পেয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে–এশীয় দেশসমূহ থেকে পাপকর্মে ইউরোপ কি কিছু কম এগুচ্ছে? তাহলে কেন এ অকার্যকর ব্যবস্থাপত্র পুন:পরীক্ষা করা হয় নি? এ পৃথিবীতে ক্ষণস্থায়ী স্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেক ডাক্তার ও রোগী এ রীতি অনুসরণ করে চলেছে যে, এক ব্যবস্থাপত্রে এক সপ্তাহে বা দশদিনের মধ্যে উপকার দেখা না গেলে সে ব্যবস্থাপত্র পরিবর্তন করে আরও কোন ভাল ব্যবস্থার চিন্তা করা হয়। তাহলে ভুল সাব্যস্ত হবার পর এ পর্যন্ত আজও কেন এ ব্যবস্থাপত্র বদলানো হয় নি? 'মসীহের রক্তের ওপর বিশ্বাস আনয়ন প্রকৃত মুক্তি দান করে– ১৯০০ বছর (বর্তমানে ২০১৬ বছর– প্রকাশক) বিফলে অতিবাহিত হবার পরও কি এরূপ ধারণা পোষণ করা উচিত? অথবা এটি কি আশা করা যাবে যে, বর্তমানকাল অব্দি যদিও কোন বিশিষ্ট মীমাংসাকারীর আবির্ভাব ঘটে নি কিন্তু ভবিষ্যতে সে যুগ আসবে যখন দুনিয়াতে খ্রিষ্টানগণ পাপাচার ও মাতলামী থেকে সবার চেয়ে অধিক আত্মসংযমী হবে? ইউরোপের যে কোন দেশে বসবাসকারী কোন ব্যক্তি যদিও সাক্ষ্য দেন যে এ উক্তিগুলো সঠিক, কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি যিনি কখনো ইউরোপ ভ্রমণ অথবা প্যারিস বা অন্যান্য শহরে কিছুদিন অবস্থান করেছেন, তিনি এ সাক্ষ্য দিতে কোন দ্বিধা করবেন না যে,- বর্তমানে ইউরোপের কতক অংশের অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেকের দৃষ্টিতে 'ব্যভিচার' কোন পাপই নয়। তাদের বিবেচনায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা নিষিদ্ধ কিন্তু কু-দৃষ্টি নিষিদ্ধ নয়। একথা সত্যি যে, ফ্রান্স ও অন্যান্য স্থানে লক্ষ লক্ষ মহিলা রয়েছে যাদের স্বামীর প্রয়োজন নেই। সুতরাং হয়তো এখন একথা বলতে হবে যে, তাদের জন্য ইঞ্জীল থেকে কোন নতুন শ্লোক বেরিয়ে এসেছে যা দ্বারা এসব কার্যকলাপ হালাল (বৈধ) হয়ে গেছে, অথবা অবশ্যই বলতে হবে যে, মসীহ্‌র রক্তের ব্যবস্থাপত্র বিপরীত প্রভাবটা সৃষ্টি করেছে এবং 'দাবি' ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হলো– প্রকৃতপক্ষে এ ব্যবস্থাপত্রই সঠিক ছিল না এবং একের মৃত্যুতে অপরের মুক্তিলাভের মধ্যে কোন বাস্তব সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তা'লার জীবিত থাকাই হলো সব কল্যাণের কেন্দ্র–তাঁর মৃত্যুতে নয়; সূর্য ডুবলে নয়, সূর্যোদয়েই আলোর জন্ম। যেহেতু এ ব্যবস্থাপত্রে পাপ থেকে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্য সফল হতে পারে নি, সুতরাং এ মতবাদও আর সঠিক থাকলো না যে, তিনি (ঈসা-আ.) খোদার পুত্র ছিলেন যিনি এ উদ্দেশ্যে নিজের জীবনকে ধ্বংস করেছেন। আমরা খোদা সম্বন্ধে এ ধরনের মৃত্যু চিন্তা করতে পারি না যে, জীবনও দিতে হলো অথচ কাজও কিছু হলো না। প্রথমত এ কথাই খোদা তা'লার আদি ঐশী বিধানের পরিপন্থী যে, খোদা স্বয়ং নিজের মৃত্যু, ধ্বংস, সর্বপ্রকার ক্ষতি ও অপমান স্বীকার করে নিয়ে এক নারীগর্ভে জন্ম নিতে পারেন। কেননা, এ দাবি কোন দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত হয় নি যাতে একথা বোধগম্য হয় যে, এর আগেও খোদা তা'লা দু'চার বার এরূপ প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন আর মানুষ মনে স্বান্তনা পেয়েছে, আর না মানবীয় অলৌকিকতার সীমা বহির্ভূত খোদা তা'লার বিস্ময়াতীত ক্রিয়া প্রদর্শনে এ দাবিকে প্রমানের চূড়ান্তে পৌঁছানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে কারণে এ মতবাদের সৃষ্টি, সেই আসল উদ্দেশ্যটাই একেবারে হারিয়ে গেছে। দুনিয়াতে ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থে প্রধান দু'টি পাপের একটা হলো মদ্যপান

আর অপরটি 'ব্যভিচার'। এখন বলুন, একথা কি সত্য নয় যে, ইউরোপের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী এ উভয় পাপ-কর্মে পুরোপুরি লিপ্ত রয়েছে? বরং এতে আমি কোন অতিশয়োক্তি করছি না যে, মদ্যপানের ক্ষেত্রে এশিয়ার সব দেশের তুলনায় ইউরোপ অগ্রগামী রয়েছে এবং ইউরোপের অধিকাংশ শহরে এত অধিক মদের দোকান রয়েছে যে, আমাদের এখানকার ছোট ছোট শহরের সব রকমের দোকান একত্রিত করলেও তার চেয়ে সংখ্যায় কম হবে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মদ হলো সব পাপের মূল। কেননা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মদ মানুষকে মাতাল করে খুন করতেও দু:সাহসী করে তোলে। আর অন্যান্য পাপাচার হলো এর জরুরী উপাদান। আমি সত্যি সত্যি এবং জোরের সাথে বলছি, 'মদ' ও 'তাক্ওয়া' (খোদা-ভীরুতা) কখনও একত্রিত হতে পারে না। যে ব্যক্তি এর অশুভ পরিণাম সম্বন্ধে অজ্ঞ সে আদৌ বুদ্ধিমান নয়। এতে আরও একটা বড় বিপদ রয়েছে যে, এ অভ্যাস ত্যাগ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

যদি প্রশ্ন করা হয়– মসীহ্র রক্তদান যদি পাপ মোচন করতে সক্ষম না হয়, যেমন বাস্তবেও তা হয় নি, তাহলে পাপ থেকে পবিত্রতা লাভের কোন প্রতিকার আছে কি নেই, কেননা, অপবিত্র জীবন মৃত্যুর চেয়েও নিকৃষ্ট?

এ প্রশ্নের জবাবে আমি না শুধু জোরালো দাবির মাধ্যমে বরং আপন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষিত বাস্তবতার আলোকে উপস্থাপন করছি যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে পাপ ও অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকার একটিমাত্র উপায় সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। তা হলো– **নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ ও উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় নিদর্শন**। এর মাধ্যমে মানুষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ঐ স্তরে গিয়ে পৌঁছে যা প্রকৃতপক্ষে খোদাকে দেখিয়ে দেয় এবং তার নিকট এ সত্য উদঘাটিত হয়ে যায় যে, খোদা তা'লার অভিশাপ এক সর্বগ্রাসী আগুন। পুনরায় ঐশী সৌন্দর্য বিকশিত হয়ে প্রমাণিত হয় যে– পরিপূর্ণ আনন্দ খোদাতেই নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ জালালী ও জামালী (প্রতাপ ও স্নিগ্ধতা) রূপে সব আবরণ উন্মোচিত করে দেয়া হয়। এটাই সে পন্থা যা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে পরিণামে মানুষের মধ্যে এক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ উত্তর শুনে কতক লোক বলে উঠবে, "আমরা কি খোদাতে বিশ্বাসী নই, খোদাকে ভয় করি না, আর তাঁকে ভালোবাসি না, অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকি সারা দুনিয়ার মানুষ কি খোদাকে মান্য করে না?" অথচ তারা বিভিন্ন গুনাহ্ও করছে এবং সর্বপ্রকার পাপকর্মে প্রকাশ্যে লিপ্ত রয়েছে। এর উত্তর হলো– ঈমান (বিশ্বাস) একটা ভিন্ন জিনিস আর একটা ভিন্ন জিনিস হলো ইরফান (তত্ত্ব-জ্ঞান)। আমার বক্তব্যের অর্থ এ নয় যে, মু'মিন পাপ থেকে রক্ষা পায় বরং অর্থ হলো, প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানী ব্যক্তি পাপ থেকে রক্ষা পায়, অর্থাৎ সে ব্যক্তি, যে খোদার ভয় ও ভালোবাসা উভয়ের স্বাদই গ্রহণ করেছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন, শয়তানের তো প্রকৃত জ্ঞান রয়েছে তাহলে কীভাবে সে অবাধ্য হলো? এর একমাত্র উত্তর- সেই 'প্রকৃত জ্ঞান' তার কখনো লাভ হয় নি যা পুণ্যাত্মাগণকে দান করা হয়। মানুষ নিশ্চয়ই স্বভাবত: পরিপূর্ণ জ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে ও ধ্বংসের ভয়াবহ পথ দেখলে তা এড়িয়ে চলে। এক্ষেত্রে ঈমান বা

আবার দেখে নেয়া হলো ইরফান বা তত্ত্ব-জ্ঞানের তাৎপর্য। সুতরাং একই আত্মার তত্ত্ব-জ্ঞান ও পাপ উভয়ের একত্রিত হওয়া অসম্ভব যেরূপভাবে দিন ও রাতের একই সময়ে মিলন অসম্ভব।

এটা নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা যে, কোন জিনিস উপকারী প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ তার প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং যখন তা ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় সে মুহূর্তেই মন সেটাকে ভয় করতে থাকে। যেমন– কারো হাতে সেঁকো বিষ রয়েছে। না জেনে সেটাকে বংশলোচন বা অন্য কোন উপকারী জিনিস মনে করে একবারই এক বা দু'তোলা পর্যন্তও খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু এ জীবন-বিধ্বংসী বিষের পরিচয় যে জানে সে এক মাসা বা ৮ রতি পরিমাণও তা সেবন করতে পারে না। কেননা, সে জানে এটা খেলে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। অনুরূপভাবে মানুষের যখনই এ উপলব্ধি জন্মে যে, নি:সন্দেহে খোদা বিদ্যমান আছেন এবং তার দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার পাপ শাস্তিযোগ্য; যেমন চুরি, রক্তপাত, মন্দকর্ম, অত্যাচার, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অংশীবাদিতা বা শিরক, মিথ্যা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, গর্ব, কপটতা হারামখোরী (অবৈধ বস্তু ভক্ষণ), প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, প্রতারণা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কর্তব্যে শিথিলতা, কামাসক্তের ন্যায় জীবন যাপন করা, খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা, খোদাকে ভয় না করা, তাঁর বান্দাগণের (দাঁসগণের) প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন না করা, খোদাকে অন্তরে ভীতিসহকারে স্মরণ না করা, বিলাসিতা ও পার্থিব সুখভোগে নিমজ্জিত হওয়া, প্রকৃত দাতা খোদাকে ভুলে যাওয়া, দোয়া ও নম্রতা থেকে নিজেকে দূরে রাখা, জিনিসে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা ও ওজনে কম দেয়া, বাজার দর থেকে বেশী দামে বিক্রি করা, মাতা-পিতার সেবা না করা, স্ত্রীর সাথে সু-সম্পর্ক বজায় না রাখা, স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য না করা, নিষিদ্ধ পুরুষ বা নারীকে কুদৃষ্টিতে দেখা, অনাথ, অক্ষম, দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি মনোযোগী না হওয়া, প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন না করা এবং তাদেরকে কষ্ট দেয়া, নিজের গরিমা প্রদর্শনের জন্য অন্যকে হেয় জ্ঞান করা, কারো সাথে পীড়াদায়ক শব্দ উচ্চারণে ঠাট্টা করা অথবা অপমানের উদ্দেশ্যে তার শারীরিক কোন ত্রুটি বর্ণনা করা অথবা তাকে কোন খারাপ উপাধি দেয়া, বা অন্যায় অপবাদ দেয়া, খোদার প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং নাউযুবিল্লাহ্ (আমরা এথেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি) নিজেকে নবী, রসূল বা খোদাকর্তৃক প্রেরিত হবার মিথ্যা দাবি করা, খোদার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা একজন ন্যায়বিচারক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং দুষ্টামী করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা- এগুলো সবই পাপ যার প্রত্যেকটি অবশ্যই শাস্তিযোগ্য- একথা জানা থাকলে পাপ আপনা থেকেই পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

আবার হয়তো ধোঁকায় পড়ে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, 'আমি বিশ্বাস করি খোদা বর্তমান আছেন এবং পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে- তা সত্ত্বেও আমার দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়, সে জন্য তো আমাকে অন্য কোন ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী হতে হয়- তাহলে তাকে আমি সে উত্তরই দেবো, যেরূপ আগে দিয়ে এসেছি যে, 'পাপ করার সাথে

সাথেই বিদ্যুতের ন্যায় তোমার ওপর শাস্তির আগুন বর্ষিত হবে'- এ বিষয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও তুমি পাপ করতে সাহস পাবে তা কখনো বা কোনমতেই সম্ভব নয়। এটা এরূপ এক নীতি যা কোনভাবেই ভঙ্গ হতে পারে না। ভেবে দেখ, খুব ভাল করে ভেবে দেখ- যেসব ক্ষেত্রে শাস্তি পাওয়া সম্বন্ধে তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে, সেখানে কখনো তুমি এ বিশ্বাসের বিপরীত কাজ করবে না। আচ্ছা, বলতো আগুনের মধ্যে কি তুমি হাত দিতে পারবে? পাহাড়ের চূড়া থেকে কি নিজেকে নিচে ফেলে দিতে পারবে? কূপের ভেতরে কি তুমি পড়তে পারবে? চলন্ত ট্রেনের সামনে কি শুয়ে থাকতে পারবে? বাঘের মুখের ভেতরে কি নিজের হাত ঢুকিয়ে দিতে পারবে? পাগলা কুকুরের সামনে কি নিজের পা এগিয়ে দিতে পারবে? যেখানে ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হচ্ছে তুমি কি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে? যে ঘরের কড়িকাঠ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে বা ভূমিকম্পে মাটি নিচে ধ্বসে যাচ্ছে সেখান থেকে কি তুমি তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাবে না? বলতো, তোমাদের মধ্যে কেউ আছে কি, যে নিজের বিছানায় একটা বিষধর সাপ দেখে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে নিচে নেমে আসবে না? এরূপ একজন লোকের নাম বল দেখি, যে নিজের শোবার ঘরে আগুন লাগলে সবকিছু ফেলে বাইরে চলে আসে না? তাহলে এখন বল– তোমরা কেন এরূপ কর এবং এ সব অনিষ্টকর জিনিস থেকে কেন দূরে সরে যাও? কিন্তু যে সমস্ত পাপের কথা যা আমি এক্ষুনি লিখে এসেছি তা থেকে কেন সরে যাও না? এর কারণ কী? সুতরাং, মনে রাখবে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনার পর এ উত্তর দেবেন যে, 'উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের পার্থক্য রয়েছে'। অর্থাৎ খোদা তা'লার নিরূপিত পাপ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান অপূর্ণ। পাপকে তো তারা খারাপ মনে করে, কিন্তু তা বাঘ আর সাপের মত মনে করে না এবং গোপনে তারা এ ধারণা পোষণ করে যে, এ শাস্তি নিশ্চিত নয়, এমনকি খোদার নিশ্চিৎ সত্তা সম্বন্ধে তারা সন্দিহান যে, তিনি আছেন কি নেই। যদি থেকেও থাকেন তাহলে কে জানে আত্মার মৃত্যুর পর তা অমর থাকবে কি না; যদি অমর থাকেও তবে ঐসব অপরাধের কোন শাস্তি আছে কি না। নি:সন্দেহে অনেকের মনে এ একই ধারণা সুপ্ত রয়েছে, যে সম্বন্ধে তারা বেখবর। কিন্তু ঐ ভয়-ভীতির সর্বাবস্থায়ই তারা সাবধানতা অবলম্বন করে থাকে। যে সম্বন্ধে আমি উপরে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছি। তারা সবাই নিশ্চিত যে, ওখানে গেলে ধ্বংস অনিবার্য। সেজন্য সেগুলোর ধারে কাছেও তারা যায় না। বরং ঘটনাক্রমে এরূপ বস্তুর সম্মুখীন হলে চীৎকার দিয়ে দূরে সরে যায়। সুতরাং প্রকৃত বাস্তবতা হলো– ওসব জিনিস দেখার সময় মানুষের নিশ্চিত জ্ঞান থাকে যে, সেগুলো ব্যবহারের পরিণাম ধ্বংস। কিন্তু ধর্মীয় আদেশ পালনে তাদের জ্ঞান নিশ্চিত নয় বরং আছে মাত্র নিছক একটি ধারণা। এখানে আছে সাক্ষাৎ খোদা দর্শন আর ওখানে শুধু কিস্‌সা-কাহিনী। শুধু কাহিনীতেই কখনো পাপ বিদূরিত হতে পারে না। অতএব, তোমাদেরকে আমি সত্যি সত্যি বলছি– একজন মসীহ্ নয়, বরং সহস্র মসীহ্ ক্রুশে প্রাণ দিয়েও তোমাদেরকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পারবে না। কারণ, প্রকৃত ভীতি বা প্রকৃত ভালোবাসাই একমাত্র পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথম কথা হলো, মসীহ্‌র ক্রুশে

কোনই সম্পর্ক নেই। চিন্তা করলে দেখবে যে, তাদের এ দাবি আঁধারের আবর্তে রয়েছে। এতে না অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে, না মসীহের আত্মাহুতির তৎপরতায় অপরের পাপ মোচনের কোন সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃত মুক্তির দর্শন হলো এ পৃথিবীতেই মানুষ পাপের দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু চিন্তা করে দেখতো, কাহিনী অনুসরণে কি তোমরা পাপের দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করেছ অথবা কখনো কি কেউ এ নিরর্থক কাহিনী দ্বারা মুক্তি পেয়েছে যাতে কোন সত্যতা নেই এবং প্রকৃত মুক্তিলাভের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই? পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্র খুঁজে দেখ এরূপ কাউকেও পাবে না, যে এ গল্প-কাহিনীর মাধ্যমে সে সত্যিকারের পবিত্রতার স্তরে পৌঁছে গেছে যাদ্বারা খোদার দর্শন লাভ হয় এবং যেখানে আপন পাপের প্রতি শুধু বিতৃষ্ণাই জাগে না বরং বেহেশ্‌তের আকারে সত্যের আস্বাদ লাভ শুরু হয়ে যায়। মানবাত্মা তখন পানির ন্যায় প্রবাহিত হয়ে খোদা তা'লার আস্তানায় নিপতিত হয়। আকাশ থেকে এক আলো অবতীর্ণ হয়ে ইন্দ্রিয় লালসার সকল অন্ধকার দূর করে দেয়। অনুরূপভাবে এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে ঘরের চারদিকের জানালা খুলে দিলে দেখবে প্রাকৃতিক নিয়মে তৎক্ষণাৎ সূর্যের আলো তোমার ঘরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যদি জানালা বন্ধ রাখ তাহলে কোন কিচ্ছা-কাহিনীতে সে আলো ঘরের ভেতরে আসতে পারবে না। আলো পেতে হলে তোমাকে অবশ্যই নিজের অবস্থান থেকে উঠে গিয়ে জানালাগুলো খুলে দিতে হবে তখন আলো আপনি থেকেই ভেতরে এসে তোমার ঘরকে আলোকিত করে দেবে। পানির কথা ভাবলেই কি কারো পিপাসা মিটবে? নিশ্চয়ই না। বরং তাকে উঠে-পড়ে ঝরণার কাছে গিয়ে স্বচ্ছ শীতল পানিতে ঠোঁট রেখে তা পান করতে হবে, সুমিষ্ট পানিতে তখন সে পরিতৃপ্ত হবে।

সুতরাং একীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো সে পানি যাদ্বারা তৃপ্তিলাভ করবে এবং পাপের যন্ত্রণা ও জ্বালা দূর হতে থাকবে। পাপ থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য আকাশের নিচে এছাড়া কোন বিকল্প নেই। কোন ক্রুশ তোমাকে পাপমুক্ত করতে পারবেনা, কোন রক্ত তোমার ইন্দ্রিয় লালসা দমনে সক্ষম নয়। পবিত্র মুক্তির সাথে এগুলোর কোন সম্বন্ধ বা সম্পর্ক নেই। বাস্তবতাকে উপলব্ধি কর, সত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা কর। পার্থিব বিষয়াবলীর ন্যায় এ বিষয়টিকেও পরীক্ষা করে দেখ। তাহলে শীঘ্রই বুঝতে পারবে যে, প্রকৃত একীন ছাড়া কোন আলো নেই যা তোমাকে প্রবৃত্তির কামনার অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারে, পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন স্বচ্ছ পানি ব্যতিরেকে তোমার অন্তরের আবর্জনাকে কোন কিছুই ধুয়ে ফেলতে পারবে না। খোদা-দর্শনের স্বচ্ছ শীতল পানি ব্যতিরেকে তোমার অন্তরের জ্বালা-যন্ত্রণা কখনো দূর হতে পারে না। সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, যে তোমাকে নানাবিধ উপায় বলে দেয় এবং মূর্খ সে ব্যক্তি, যে অন্য প্রকার চিকিৎসা গ্রহণ করতে চায়। তারা তোমাকে আলো দান করতে পারে না এবং আরও বেশী অন্ধকারের গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। তোমাকে শীতল পানি না দিয়ে আরও জ্বালা-যন্ত্রণা বাড়িয়ে দেয়। সেই রক্ত ছাড়া কোন রক্ত তোমাকে কল্যাণ পৌঁছাতে পারবে না যা একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাসের) খাদ্যের মাধ্যমে স্বয়ং তোমার মধ্যে তৈরী হয়। কোন ক্রুশ তোমাকে

মুক্তি দিতে পারে না বরং সঠিক পথের ক্রুশ অর্থাৎ 'সত্যের উপর ধৈর্য ধারণ' তোমাকে মুক্তি দিতে সক্ষম।

অতএব, তুমি চক্ষু উন্মীলিত কর এবং দেখ। একথা কি সত্য নয় যে, আলোর সাহায্যেই তুমি দেখতে পার- অন্য কোন মাধ্যমে নয়? সোজা পথেই কেবল গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে- অন্য কোন পথে নয়। দুনিয়ার জিনিস রয়েছে তোমার সম্মুখে এবং ধর্মীয় জিনিস 'দূরে'। সুতরাং যা নিকটে রয়েছে সে সম্বন্ধে চিন্তা করে এর বিধানকে উপলব্ধি করার পর সেই নিরিখে 'দূরকে' আন্দাজ করে নাও। কারণ তিনিই সেই একক সত্তা এবং উভয় বিধানই তাঁর তৈরী। তোমাদের মধ্যে কি কেউ চক্ষু ছাড়া দেখতে পারে, কর্ণ ছাড়া শুনতে পারে ও জিহ্বা ছাড়া কথা বলতে পারে? তাহলে কেন তোমরা এই বিধানকে অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপকৃত হচ্ছো না? তোমার চক্ষু থাকা অবস্থায় তুমি কি এক গভীর খাদের নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করতে পার? কান থাকা সত্ত্বেও কি তুমি চোরের আগমনের সাড়া পেয়ে সাবধান হবে না? অথচ যে জিহ্বা তেতো ও মিষ্টির মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে দেয় তা সত্ত্বেও কি তুমি তেতো ও বিষাক্ত জিনিস খেতে পারো যা খেলে জিভে যন্ত্রণা ও পাকাশয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে বমি হবে এবং শরীরকে রুগ্ন করে পরিণামে তোমাকে ধ্বংস করে দিবে!

সুতরাং এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বুঝে নাও যে, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য আধ্যাত্মিকভাবেও তুমি এক আলোর মুখাপেক্ষী যাদ্বারা তুমি অন্যায় পথের সকল অন্যায় দেখতে পাও, চোর ডাকাতদের চলাচলের পথ থেকে তোমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে এরূপ সতর্কবাণী যেন তুমি শুনতে পাও এবং এরূপ আস্বাদনের শক্তি তুমি লাভ করতে পার যদ্বারা তেতো ও মিষ্টি এবং বিষ ও প্রতিষেধক এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম হও। সুতরাং ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হলো- "আলো থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজে অন্ধ থেকে কারও রক্তের বিনিময়ে মুক্তিলাভ কোনমতেই সম্ভব নয়। মুক্তি এমন জিনিস নয় যা পরবর্তী জীবনে লাভ হয়। প্রকৃত মুক্তি এ দুনিয়াতেই লাভ হয় এবং তা হলো এক প্রকার আলো যা অন্তরের গভীরে আপতিত হয়ে ধ্বংসের গহ্বরকে দেখিয়ে দেয়।" সত্য এবং প্রজ্ঞার পথ অবলম্বন কর, এতে খোদাকে লাভ করবে। নিজ অন্তরে উত্তাপ সৃষ্টি কর যেন সত্যের দিকে এগোতে পার। হতভাগ্য ঐ অন্তর যা শিথিল হয়ে আছে ও ভাগ্যহীন সে স্বভাব, যা হতাশায় ভুগছে, এবং সে বিবেকের মৃত্যু ঘটেছে যাতে দীপ্তি নেই। সুতরাং তোমরা সেই বালতির অবস্থায় প্রবেশ করো না যা শূন্য অবস্থায় কূপের ভেতরে গিয়ে পূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। ঐ চালনির মত হয়ো না যাতে সামান্য পানিও জমে থাকতে পারে না- একদিক দিয়ে ঢুকে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। চেষ্টা কর যাতে স্বাস্থ্য ফিরে পাও এবং পার্থিব লালসার জ্বরের বিষাক্ত তাপ দূর হয়ে যায়, যে কারণে চোখে জ্যোতিঃ নেই, কান সঠিক শুনতে পায় না, জিহ্বার আস্বাদ বিকৃত ও হাত-পা বল-শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। এক সম্পর্ক ছিন্ন কর তাহলে অপর এক সম্পর্ক তৈরি হবে। একদিক থেকে মনকে নির্লিপ্ত রাখ যাতে করে অপরদিকে মন পথের সন্ধান পায়। দুনিয়ার নোংরা কীট

ছুঁড়ে ফেলে দাও যেন আকাশের উজ্জ্বল হীরক তোমাকে দান করা হয়। আপন প্রারম্ভের দিকে নজর দাও, সেই প্রারম্ভ যখন আদমকে খোদা-ঈ রূহ্ (ঐশী আত্মা) দ্বারা জীবিত করা হয়েছিল, যাতে সবকিছুর ওপর প্রভুত্ব লাভ হয়– যেরূপে তোমাদের পিতা (আদম-আ.) তা পেয়েছিলেন।

দিন শেষ হলো, এখন আসরের সময়। প্রায় ৪ ঘটিকা থেকে অপরাহ্ন বিকালের আগমন সূচিত হয়। সূর্য অস্তমিত প্রায়। যদি দেখতে হয়, এখনি দেখে নাও পরে আর কি দেখবে? ইট-পাথর নয়, ফিরে যাবার আগে নিজের জন্য উত্তম খাবার এবং পরনের জন্য পোষাক পাঠিয়ে দাও, কাঁটা আবর্জনা নয়। সেই খোদা, সন্তান জন্মের আগেই যিনি মায়ের বুকে দুধ ঢেলে দেন, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই যুগে ও তোমাদেরই দেশে একজনকে পাঠিয়েছেন যেন মায়ের ন্যায় নিজের বুক থেকে তোমাদের দুধ পান করান। তিনিই তোমাদেরকে একীনের (দৃঢ়-বিশ্বাসের) দুধ পান করাবেন যা হবে সূর্যের চেয়ে অধিক স্বচ্ছ, সকল পানীয় থেকে অধিক সুমিষ্ট। যদি তুমি মৃত না হয়ে জীবিত জন্মে থাক তাহলে টাটকা দুধ পান করবার জন্য ঐ স্তনের দিকে দৌঁড়ে এসো। নিজের পাত্র থেকে ঐ দুধ ফেলে দাও যা টাটকা নয়, দুষিত বাতাস যা দুর্গন্ধ করে ফেলেছে। এতে পোকা কিলবিল করছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো না। ঐ দুধ তোমাদের কোন পুষ্টি সাধন করতে পারবে না বরং ভেতরে যাওয়া মাত্রই স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে ফেলবে। কারণ তখন তা দুধ থাকবে না বরং বিষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক শুভ্রতাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখবে না, কারণ কতক কালো কতক সাদার চেয়েও ভাল হয়ে থাকে। যেমন, কালো চুল যৌবনের শক্তির প্রতীক এবং সাদা চুল দুর্বল, ক্ষীণ ও বার্ধক্যের পরিচয় বহন করে থাকে। অনুরূপভাবে লোক দেখানো শুভ্রতা ও পুণ্যের প্রদর্শনী মূল্যহীন। সোজা ও সরল পাপী ব্যক্তিও এর চেয়ে ভাল, তারা প্রতারণা করে নিজেদের পাপকে লুকিয়ে রাখে না। অতএব, আমি সত্যি সত্যি বলছি, সে খোদার ক্ষমা লাভের অধিক নিকটবর্তী। ঐ জিনিসের প্রতি নির্ভরশীল হয়ো না যা নিশ্চিত নয়। এর সাথে কোন প্রকৃত আলো নেই, কোন পবিত্র দর্শন তা সমর্থন করে না বরং এর সব কিছুই ধ্বংসের পথ। তোমার মনের কামনা-বাসনাগুলোর পর্যালোচনা করে দেখ যে সেগুলো কি চায় এবং কিসে নিশ্চিত হতে পার যে- 'এ উপায়ে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবো।'

কীসের ভিত্তিতে তাদের বিবেক বলছে যে, "এসব কিছুই আমাদের জন্য যথেষ্ট"? কোন অন্তর কি একথা স্বীকার করবে যে, মসীহের রক্ত তাদের মনকে পাপের প্রতি ভীতির সঞ্চার করবে? বরং অভিজ্ঞতা বলছে আরও দুঃসাহসী করে তোলে। কারণ মসীহের রক্তে নির্ভরশীল ব্যক্তি একথা জানে যে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত শোধ হয়ে গেছে। কিন্তু পাপের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে যাকে জ্ঞান দান করা হবে সে কোনমতেই পাপকর্ম করতে পারে না কারণ এতে সে নিজের ধ্বংস দেখতে পায়।

সুতরাং খোদার সন্নিধান থেকে একজনকে পাঠানো হয়েছে যিনি তোমাদেরকে জ্ঞানের এরূপ স্তরে পৌঁছাতে চান যাতে তোমাদের আত্মা খোদাকে দেখতে পায় এবং

পাপের বিষকে প্রত্যক্ষ করে। স্বেচ্ছায় তুমি তখন পাপ থেকে পালাবে যেমন বাঘ থেকে মানুষ পালিয়ে যায়। অতএব, এই পত্রিকাটির (Review of Religions) অবশ্য করণীয় হলো- এসব শিক্ষা ও নিদর্শনগুলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া যাতে করে ওসব লোক, যারা ক্রুশ ও মসীহের রক্তে মুক্তি খুঁজে বেড়ায়, তারা প্রকৃত মুক্তির প্রস্রবণকে দেখে নেয়। প্রকৃত মুক্তি এ পানিতে নেই যাতে একভাগ পানি ও বিশভাগ কাঁদা ও আবর্জনা রয়েছে। আত্মাকে বিধৌত করার পানি যথাসময়ে আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। এ পানিতে পরিপূর্ণ যে নদী-নালা প্রবাহিত হয় তা ময়লা বা আবর্জনামুক্ত এবং মানুষ এ থেকে পরিষ্কার ও উত্তম পানি ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু যে নদী-নালা শুষ্ক বা যাতে সামান্য পানি বিকৃত অবস্থায় রয়েছে, তা এরূপ সুপেয় ও পরিষ্কার থাকতে পারে না। কারণ অনেক কাঁদা এসে এতে মিশে যায় এবং অনেক পশু-পাখী এতে মল-মূত্র ত্যাগ করে। অনুরূপভাবে, যে অন্তরকে খোদা তা'লার জ্ঞান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা দান করা হয়েছে, তা ঐ কানায় কানায় পূর্ণ নদী-নালার ন্যায়, সকল জমিকে প্লাবিত করে এবং এর পরিষ্কার ও ঠান্ডা পানি আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে অন্তরের জ্বালাকে দূর করে দেয়। এ পানি নিজেই শুধু পবিত্র নয় বরং তা পবিত্রতাও দান করে থাকে। কেননা, তা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করে, যা অন্তরের মরিচাকে সাফ করে দিয়ে পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। কিন্তু কাদামিশ্রিত সামান্য পানি, সৃষ্টির কোন উপকার সাধনে সক্ষম নয় এবং তা নিজেকেও পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে না।

অতএব, সময় হয়ে গেছে। ওঠো, একীনের (নিশ্চয়তার) পানির সন্ধানে তৎপর হও- তোমরা তা পাবে। পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে এক স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হও। প্রত্যেক সন্দেহ ও আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে পাপ থেকে দূরে সরে যাও। এ সে পানি যা পাপের সব গ্লানিকে ধুয়ে মুছে অন্তরের ফলককে পরিষ্কার করে ঐশী ছাপ গ্রহণের উপযোগী করে তুলবে। ইন্দ্রিয়শক্তির লিখনকে হৃদয়ের ফলক থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারবে না, যে পর্যন্ত না একীনের পবিত্র পানি দ্বারা তা ধুয়ে ফেল। লক্ষ্য স্থির কর যাতে সামর্থ্য লাভ হয়। অন্বেষণ কর যেন সহজলভ্য করে দেয়া হয়। অন্তরকে বিনয়ী কর, তাহলে এসব কথাকে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। কারণ এসব কথাকে উপলব্ধি করা কঠিন হৃদয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

তুমি কি ভাবছো এ পথ ছাড়া বিকল্প কোন উপায়ে তোমার হৃদয়ে আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হবে? সেই চিরঞ্জীব খোদার প্রতাপ তোমার নিকট উন্মুক্ত হবে? তাঁর সার্বভৌমত্ব তোমার নিকট প্রকাশিত হবে, মন নিশ্চয়তার আলোকে পরিপূর্ণ হবে এবং অন্য কোন উপায়ে পাপকে সত্যিকারভাবে ঘৃণা করতে পারবে? কখনো না। একটি মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে, তা হল– এক খোদা এবং এক বিধান।

("রিভিউ অব রিলিজিয়নস্" জানুয়ারি ১৯০২, উর্দূ সংস্করণ)।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

KIBHABE PAP THEKE MUKTI PAWA JAE

Gunah se najat kiu kar mil sakti hei

How to get Rid of the Bondage of Sin

The article 'How to get rid of the bondage of sin' was written in Urdu by the holy founder of the Ahmadiyya Movement Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (PB). Its English version first appeared in 'Review of Religions' Qadian, of January, 1902. Its Bangla version has now been produced in the present booklet. After reading this article Tolstoi, the most distinguished personality in modern Russian literature, wrote back, "I approved very much two articles, "How to Get Rid of Sin' and 'The Life to Come' The idea is very profound and very true." (As recorded in Review of Religions, September, 1911)

Starting with an assessment of the extent to which the poison of sin has spread in the world, the article prescribes the most efficactious remedy for its eradication, i.e. a 'perfect knowledge of God' and an unabating certainity in the belief that obedience to His will constitutes the highest good.

© Islam International Publications Ltd.

ISBN 978-984-991-062-6

9789849910626